The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 34, 2024 (P. 83-102)

সমতলবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাহাড় নির্ভর জীবন ও জীবিকা: প্রেক্ষিত মীরসরাইয়ের মধ্য-মঘাদিয়া গ্রাম

ফারিয়া মাহ্জেবীন[১]
মোঃ আসাদুল হক[২]

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সীমিত পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত উষ্ণ মন্ডলীয় চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি নিয়ে পাহাড়ি বনাঞ্চল গঠিত। স্থানীয় সমতলবাসী বাঙালিদের একাংশ এই বনাঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ আহরণের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে; আর একারণে এই জনগোষ্ঠীকে 'পাহাড় নির্ভর' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রচলিত ধারণানুসারে, 'পাহাড় নির্ভর' বলতে পাহাড়ে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'কেই বোঝানো হয়। কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধটিতে (গবেষণায়) সমতলের বাঙালি জনগোষ্ঠীর 'পাহাড় নির্ভর' জীবন ও জীবিকার প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, স্থানীয় পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠী কেন এবং কিভাবে পাহাড়ের সাথে সম্পৃক্ত সেই বিষয়টি এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পাশাপশি, বর্তমানে 'পাহাড় নির্ভর' এই জনগোষ্ঠীর পেশাগত গতিশীলতার স্বরূপটিও অনুসন্ধান করা হয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করায় এবং জীবন ও জীবিকার নানা রসদ সহজলভ্য হওয়ায় ঐতিহ্যগতভাবে এবং বংশ পরম্পরায় সমতলের বাঙালি জনগোষ্ঠীর 'পাহাড় নির্ভর' জীবন ও জীবিকার ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততা তৈরি হয়। কিন্তু বর্তমানে, সরকারী ও বেসরকারী নানা পদক্ষেপ যেমন, সামাজিক বনায়ন, বন বিভাগ কর্তৃক বাগান তৈরি, বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা ভূমি অধিগ্রহণ, মূল্যস্ফীতিসহ প্রভৃতি কারণে পাহাড় নির্ভর সমতলবাসী বাঙালিদের পাহাড় কেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা অনেকটাই সীমিত হয়ে গেছে। উপরন্তু, শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিসহ সমকালীন নানা সুযোগ-সুবিধা স্থানীয় 'পাহাড় নির্ভর' জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন সাধন করছে। ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই পর্যায়ক্রমে অন্য পেশা গ্রহণ করছেন।

১. ভূমিকা

গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলগুলোর প্রায় ১.২ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য বনাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল (Fedele and Others, ২০২১) । বনাঞ্চলের নানা ধরনের মধ্যে পাহাড়ি বনাঞ্চল একটা বিশেষ প্রকরণ। ভূমিরূপ ও ভৌগোলিক বিবেচনায় বাংলাদেশকে একটি বিস্তৃত সমভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এখানে সীমিত পাহাড়ি অঞ্চলও বিদ্যমান। এই পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট, *মৌলভীবাজার* এবং হবিগঞ্জ জেলার প্রায় ১.৪০

[১] সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। E-mail: fmahjabeen01@yahoo.com
[২] সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। E-mail: haque_3236@yahoo.com

মিলিয়ন হেক্টর এলাকা জুড়ে উষ্ণ মন্ডলীয় চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি নিয়ে গঠিত হয়েছে পাহাড়ি বনাঞ্চল (Fedele and Others, 2021; বাংলাপিডিয়া, ২০১৫)।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একাংশ এসব বনাঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ যেমন, লাকড়ি, কাঠ, বাঁশ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই বনাঞ্চলই তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। বন হতে সংগৃহীত উপকরণগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিকভাবে পাহাড় নির্ভরশীলতা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত জীবন ও জীবিকার নানা বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে, স্থানীয় পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠী কেন এবং কিভাবে পাহাড়ের সাথে সম্পৃক্ত সেই বিষয়টি এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পাশাপাশি, বর্তমানে 'পাহাড় নির্ভর' এই জনগোষ্ঠীর পেশাগত গতিশীলতার স্বরূপটিও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'পাহাড় নির্ভর' বলতে সাধারণতঃ পাহাড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোকেই চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু, শুধুমাত্র উল্লেখিত নৃগোষ্ঠীগুলোই অর্থনৈতিকভাবে বা জীবিকার জন্য পাহাড়ের সম্পদের উপর নির্ভর করে না, বরং সমতলে বা পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসরত অনেক বাঙালিও অর্থনৈতিকভাবে বা জীবিকার জন্য পাহাড়ের উপর নির্ভরশীল। সমতলের বাঙ্গালীদের পাহাড় নির্ভরশীলতার এই বিষয়টি প্রচলিত গবেষণাসমূহে (Miah et al., 2014; Hossain & Ahmad, 2017; Jannat et al., 2018; Jewel et al., 2022) অনুপস্থিত, যা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে চিন্তার জগৎকে নবজ্ঞানানুসন্ধানে আলোড়িত করে। এক্ষেত্রে বর্তমান এই প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক নানা জিজ্ঞাসার উপযুক্ত, সমসাময়িক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

জীবিকা বা livelihood এর ধারণাটি একটি ব্যাপক বিষয়, যা নানাবিধ নিয়ামকের সাথে সম্পৃক্ত। জীবিকা বলতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের একগুচ্ছ কর্মকান্ড কে বুঝানো হয়, যার দ্বারা সে তার ও গৃহস্থালীর নির্ভরশীল সদস্যদের মৌলিক চাহিদাসমূহ (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণ করে থাকে এবং সন্তুষ্টির সাথে জীবন যাপন করে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী তার পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে নিজেদের জীবন সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে, সেটাই মুলতঃ জীবিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয় (Scoones, 2009)।

ঐতিহাসিক এবং পরিবেশগত বিবেচনায় বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে বসবাসকারী বাঙালি জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান উৎস হলো নিবিড় কৃষি। অপরদিকে, পাহাড়ি

অঞ্চলে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীদের জীবিকার প্রধান উৎস হলো 'জুম' চাষ (Ahamed, 2012)। বাংলাদেশের সাদৃশ ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যগত এই চিত্র পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও পরিলক্ষিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপাঞ্চল হলো উল্লেখিত বর্ণনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ (Geertz, 1963)। ভূমির গঠনরূপ, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত ভিন্নতা সাপেক্ষে মানুষের জীবিকার ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। তাত্ত্বিক পরিসরে পরিবেশগত নির্দিষ্টতাবাদীদের (Environmental Determinists) মতানুসারে, মানুষের জীবন ও জীবিকা তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তবে মানব সম্ভবতাবাদীদের (Human Posibilists) মতে, পূর্বোক্ত ধারা মানুষের সৃষ্টিশীলতা, প্রায়োগিক সক্ষমতা এবং স্বাধীন মনোবৃত্তিকে উপেক্ষা করে। এই ধারানুসারে, মানুষ তার প্রয়োজনে সাংস্কৃতিকভাবে, নানা উদ্ভাবনী ও কলা-কৌশল দ্বারা পরিবেশগত প্রভাবককে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ামকের অনুকূল ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে (Moran, 2007)। ফলে একই ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস করার পরও এক-এক মানবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাঁদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে (Moran, 2007; Stewart cited in Barnard, 2004)। বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, সমতলবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠী জীবন ও জীবিকার জন্য ঐতিহ্যগতভাবে প্রধানতঃ কৃষি কাজের বা অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হলেও গবেষিত এলাকার বাঙালি জনগোষ্ঠীর একাংশ পাহাড় নির্ভর অর্থনীতির সাথে বা শিকার ও সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাদের জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস হলো পাহাড়, তবে সেটা পাহাড়ে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীদের মত নয়; বরং সেটা কৃষক অর্থনীতির সদৃশ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

কৃষক অর্থনীতি যেমনি গৃহস্থালী ও পরিবার ভিত্তিক শ্রম দ্বারা পরিচালিত হয় (Shanin, ed. 1973), সমতলবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাহাড় নির্ভর অর্থনীতিও তাই। পাহাড় নির্ভর অর্থনীতি বলতে পাহাড় সম্পদের উপর নির্ভরশীলতাকে বোঝানো হয়। এর মধ্যে কৃষিজ দ্রব্য থেকে শুরু করে পাহাড় হতে প্রাপ্ত সকল প্রকার উপকরণই অন্তর্ভূক্ত, যা তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে এটা বোঝা জরুরী যে, সমতলের বাঙালি সম্প্রদায় একইভাবে পাহাড়ে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মত পাহাড় নির্ভর নয়। তাদের সাথে পাহাড়ের সম্পর্ক এবং পাহাড় কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা উভয়ই বহুমাত্রিক ভিন্নতার সামষ্টিক পরিচিতি বহন করে।

পাহাড় অর্থনীতিতেও ভূমির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পাহাড়ি ভূমির বৃক্ষরাজি হচ্ছে তাদের আয়ের উৎস। কিন্তু ভূমির উপর তাদের কোন অধিকার নেই। অধিকাংশ পাহাড়ই সরকারী মালিকানাধীন। এতে পাহাড়ের সম্পদ ব্যবহারকারীদের কোন প্রকার অধিকার থাকে না। পাহাড় অর্থনীতি পরিবারভিত্তিক শ্রম দ্বারা পরিচালিত, তার নিজস্ব

প্রযুক্তির (দা-কুড়াল) উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংগৃহীত দ্রব্য সে বাজারে বিক্রি করে পারিবারিক প্রয়োজন মেটায়। পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর ব্যক্তিরাও 'বেকার' ও 'কর্মহীন' থাকাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। যার জন্য তারা পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল থাকে পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে। তার উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে সে অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে। পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীও পুঁজিবাদী হিসেব অনুযায়ী তার লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি দেয় না। একারণে শ্রমের মূল্য মুনাফা প্রভৃতি হিসাব বাদ রেখে পাহাড় থেকে সংগৃহীত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে যে টাকা পায় তা দিয়ে সে তার পারিবারিক প্রয়োজন মেটায়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পাহাড়ে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে করে পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তৈরি হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী এহেন পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রচেষ্টা। সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে যদিও বলা হয়, এর মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণকে কাজে লাগানো হয় এবং মানুষের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, এতে সাধারণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত নগণ্য। প্রকল্পের নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব শুধু সরকারের, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এক্ষেত্রে কোন কিছু করার বা বলার থাকে না। লভ্যাংশ ভাগাভাগি প্রক্রিয়াটিও এখন অস্পষ্ট এবং এটা নিয়ে সংশয় তৈরির অবকাশ রয়েছে। প্রকল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের তেমন কোন সংশ্লিষ্টতা থাকে না। অধিকন্তু, তাদের কঠোর আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হয় (Khan & Begum, 1997)। কিন্তু সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মনোভাব, তাদের সামাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব কী এবং সমতলের বাঙালি পাহাড় নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থান কী সে বিষয়ে কোন বিশ্লেষণ এই লেখায় উপস্থাপিত হয়নি। সামাজিক বনায়নে রোপিত বৃক্ষ কেমন হওয়া বা কোন প্রজাতির হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সামাজিক বনায়নে যেসব বৃক্ষ রোপন করা হয় সেগুলোর অধিকাংশই স্থানীয় প্রজাতির নয়। গাইন (২০০৫) বিদেশি প্রজাতির গাছ লাগানো প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বিদেশি বৃক্ষ, লতা, পোকা-মাকড় কিংবা যেকোন জীব স্থানীয় পরিবেশ, স্থানীয় প্রজাতি ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ রকমের হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। কিন্তু বনের সাথে প্রথাগতভাবে সম্পর্কযুক্ত একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনে এই ধরণের বনায়নের নেতিবাচক প্রভাবের স্বরূপ কেমন হতে পারে তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক অব্যক্ত ও অনুল্লেখিত সকল বিষয়সমূহ সবিস্তারে পর্যালোচনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অতীতে পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকার যে অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য ছিল বর্তমানে সেগুলোর বহুমাত্রিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা পরিবর্তনশীলতা একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া যা পৃথিবীর সকল উপদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এরূপে জীবন ও জীবিকার বিষয়টি সব সময় একই অবস্থায় থাকেনা; বরং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে জীবন ও জীবিকার নানা পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়কে পরিবর্তন করা ততোটাও সহজ নয়, বিশেষ করে তা যদি হয় মানুষের মতাদর্শ বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় (Foster, 1965)। মানুষের মতাদর্শ, চেতনা বা চিন্তার প্রক্রিয়া (cognition or thought process) হলো তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরন বা অভ্যাস (habitus) এর মৌলিক ভিত্তি যা পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষেই তৈরি হয়ে থাকে (Bourdieu, 1972)। আর মানুষের চিন্তা ও অভ্যাস (human thought and habitus) এর আন্তসম্পৃক্ত প্রক্রিয়া যৌথভাবে তার সমাজ কাঠামো ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটি গঠন করে থাকে (Power, 1999)। একারণে সমাজ কাঠামো ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট হলো মানুষের জীবন ও জীবিকার চালিকা শক্তি যা পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। তবে ক্রমবর্ধমান নানা চাহিদা, সংকট, টিকে থাকার চেষ্টা এবং সর্বপরি মানুষের ইচ্ছাশক্তি (human agency) ও সামাজিক পুঁজি সমন্বিতভাবে তার সমাজ কাঠামো ও সাংস্কৃতিক উপাদানের বহুমাত্রিক পরিবর্তন সাধন করে থাকে (Power, 1999; Papacharissi & Easton, 2013; Johnston, 2016)। প্রকৃত অর্থে জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরই একটি জটিল রূপ। আর এই জটিল প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তন, ব্যাপন ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে; যেখানে শিক্ষা, উদ্ভাবন-আবিষ্কার, প্রযুক্তি, জনসংখ্যা, ক্রমবর্ধমান চাহিদা, দূর্যোগ, মানুষের এজেন্সি এবং সামাজিক পুঁজি প্রভৃতি বিষয় মূখ্য নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে (Schaefer & Lamm, 1989, pp. 616-628; Haviland et. al., 2011; Kottak, 2011); ফলে মানব জীবন ও জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়। আরো উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে 'বিশ্বায়ন' এর মত প্রক্রিয়াও এই পরিবতর্নের অন্যতম উপাদান ও প্রক্রিয়া।

তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এটা প্রতীয়মান যে, অতীতে এই পরিবর্তন মুলত সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নয়ন হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হতো, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তনকে এক ধরনের 'রদবদল' (shift) হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে, যেখানে মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে (Acharya & Kshatriya, 2014)। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি মতে, পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠির ওপর তথা তাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এবং

সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ একটি জনগোষ্ঠির পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক কাঠামো এবং সংস্কৃতির নবরূপ গঠনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে ও তা অনুধাবনে সক্ষম করে। তবে একটি সমাজের পরিবর্তনের বিষয়টিকে বুঝতে হলে শুধুমাত্র বিশ্বায়ন নয় বরং জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য মৌলিক উপাদানের সাপেক্ষে এবং তাদের আন্তসম্পর্কের ভিত্তিতেই বুঝতে হবে (Khondker & Schuerkens, 2014)। বক্ষমান প্রবন্ধে পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠির পরিবর্তিত অবস্থানকে বুঝার ক্ষেত্রে তাদের জীবন ও জীবিকার মৌলিক উপাদানসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে অতীত ও বর্তমানের অবস্থানকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার মধ্য-মঘাদিয়া গ্রাম, যা চট্টগ্রাম জেলা শহর হতে প্রায় ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে আছে (পাহাড় সারি) পাহাড়ি বনাঞ্চল আর পশ্চিমদিকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে রয়েছে উপকূলীয় বনভূমি ও সন্দ্বীপ চ্যানেল। উত্তরে রয়েছে ফেনী জেলার সোনগাজী উপজেলা, উত্তর-পূর্বে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা এবং দক্ষিণে রয়েছে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা। সমুদ্র, পাহাড় ও সমতল ভূমির সমন্বয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের এক অপরূপ লীলাভূমি হলো এই অঞ্চল। অনেকেই এই অঞ্চলকে বলে থাকে 'ভূমি ও সমুদ্রের মুক্ত বায়ুর অবাধ প্রবাহের স্থান' (ইসলাম, ২০০৫) । মধ্যমঘাদিয়া গ্রামের আয়োতন ৭৫.৬৬ একর এবং মোট লোক সংখ্যা হলো ২২৯২ জন। এর মধ্যে ১১৫২ জন পুরুষ এবং ১১৪০ জন মহিলা (উপজেলা জরিপ, ২০২২[৩])।

গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরন করে সামগ্রিক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে এবং সেই আলোকে এই প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। জুন, ২০১৮ থেকে মে, ২০১৯ সালে পরিচালিত মাঠকর্মের মাধ্যমে সংগৃহিত প্রাথমিক উপাত্তের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধের মূল বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সেকেন্ডারি তথ্য উৎস হতে সংগৃহিত তথ্যেরও যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, নিবিড় সাক্ষাৎকার, প্রধান তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, অনানুষ্ঠানিক দলীয় আলোচনা এবং কেস স্টাডি পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ১০ জন ব্যক্তির সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার, ০২টি প্রধান তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার,

[৩] চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা কতৃক ২০২২ সালে পরিচালিত গৃহস্থালী জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

১০টি কেস স্টাডি এবং ০৩টি অনানুষ্ঠানিক দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রধান তথ্যদাতাদের নির্বাচন করা হলেও অন্য অপরাপর উপাত্তদাতাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরল দৈব চয়ন পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই গবেষণার সকল উপাত্তদাতাই জীবন ও জীবিকার জন্য স্থানীয় পাহাড়ী বনাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল।

এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষিত এলাকা এবং জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাহাড় নির্ভর অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক দলীয় আলোচনার মাধ্যম্যে পাহাড় নির্ভর অর্থনীতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সমতলের বাঙ্গালীদের পাহাড় নির্ভর অর্থনীতির অতীত ও বর্তমান জীবনের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বিবরণ ও গভীরতা জানার জন্য কেস স্টাডি একটি অত্যন্ত ফলপ্রসু পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পাহাড় নির্ভর অর্থনীতির সার্বিক বিষয় সম্পর্কে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম নানা জিজ্ঞাসার সমাধান বা জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে প্রধান তথ্যদাতা পদ্ধতি অত্যন্ত সহায়ক ও কার্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪. পাহাড় নির্ভর অর্থনীতি: মধ্য-মঘাদিয়া গ্রাম

মানুষ জীবিকা নির্বাহের নিত্য নতুন পথ চিরকাল অনুসন্ধান করে আসছে। আর আশেপাশের প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা মানুষ তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে । মধ্য-মঘাদিয়া গ্রামের পূর্বদিকের মানুষের অনেকেই যেমন পাহাড় নির্ভর অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল, তেমনি পশ্চিমদিকে সন্দ্বীপ প্রণালীর কারণে অনেকেই জেলে জীবন বেছে নিয়েছে। আবার উপকূলীয় বনভূমি সৃষ্টির পর ঐ বনের উপরও পশ্চিম দিকের অনেকে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। তারা পূর্বদিকের পাহাড়শ্রেণী অপেক্ষা উপকূলীয় বনভূমি থেকেই কাঠ, বাঁশ, লাকড়ী প্রভৃতি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। উপকূলীয় বনভূমি সৃষ্টির আগে পাহাড়ে এলেও বর্তমানে এরা পূর্বদিকে আর আসে না। কেননা পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে পাহাড় শ্রেনীর দূরত্ব অনেক ও পরিশ্রমও হয় বেশী। তাই স্বল্প দূরত্বের উপকূলীয় বন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

পূর্বদিকের পাহাড় থেকে মূলতঃ কাঠ, বাঁশ, লাকড়ী সংগ্রহ করে পূর্বদিক ও গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠী। এদের কারো কারো জমি থাকলেও, বেশির ভাগই ভূমিহীন। কেউ আবার অন্য অঞ্চল থেকে কাজের আশায় এই অঞ্চলে এসেছে। কিন্তু কাজ না পাওয়ায় পাহাড় থেকে কাঠ, বাঁশ, লাকড়ী সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। যারা কোন ক্ষেত-খামারের কাজ করতে পারে না বা অন্য কাজ পারে না তারা এই পেশায় এসেছে বলে স্থানীয় জনগণের অভিমত। বর্তমানে পাহাড়ে জীবনধারণ অর্থনীতির উদ্দেশ্যে

খুব কম লোকই যায়। অনেকে আবার অন্য পেশায় যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যখন কোন কাজ থাকে না তখন পাহাড় থেকে কাঠ, বাঁশ, লাকড়ী সংগ্রহ করে। আবার এমন অনেকে আছে যারা দিন মজুরের কাজ করে ক্ষেত-খামারে। কিন্তু ফসলের কাজ সারা বছর থাকে না। যখন কাজ গ্রামে থাকে না তখন এরা পাহাড়ে যায়। তাদের একমাত্র মূলধন নিজেদের শ্রম ও প্রযুক্তি আর তাদের প্রযুক্তি হচ্ছে দা-কুড়াল ।

উপাত্তদাতাদের মতানুসারে, মধ্য-মঘাদিয়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী হলেও ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবীসহ অন্যান্য পেশার লোকজনের উপস্থিতিও বিদ্যমান। এই গ্রামের জনগোষ্ঠীর একটা অংশ জীবন ধারণের জন্য পাহাড় সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এদের পাহাড়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ থাকলেও তারা সেটা করেন না। তারা প্রতিদিন নিজ গ্রাম থেকে পাহাড়ে গমন করে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (কাঠ, বাঁশ, লাকড়ি, ফল, মূল ইত্যাদি) সংগ্রহ করে পুনরায় গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। সংগৃহীত দ্রব্যাদি সুবিধামত স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে এবং প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে নিত্য দিনের প্রয়োজন মেটায়। তারা নিজেদের এই কাজকে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করা হিসেবে গণ্য করলেও পেশা হিসেবে বিবেচনা করেন না। এই গবেষণার উপাত্তদাতাদের মতানুসারে "*আমরা কিছুই করিনা, পাহাড়ে যাই, যেটা পাই সেটা বিক্রি করে চলি*"। তারা অন্য যে কোন কাজ পেশা হিসেবে বিবেচনা করলেও নিজেদের পাহাড় নির্ভরশীলতাকে পেশা হিসেবে বিবেচনা করে না। অন্যান্য পেশার স্থানীয় লোকজনও পাহাড় নির্ভরশীলতাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। দলীয় আলোচনা হতে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুসারে, যারা পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল তারা অলস, এই কাজে পরিশ্রম কম, তুলনায় টাকা বেশি। কৃষিকাজ বা অন্যান্য পেশায় সারা দিন খাটতে হয় কিন্তু পাহাড়ে কয়েক ঘন্টা কাজ করে লাকড়ী, বাঁশ, কাঠ সংগ্রহ করা যায় আর সেগুলো বাজারে বিক্রি করলেই সংসার খরচ উঠে আসে। তবে যারা পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল তারা নিজেদের কাজটিকে কম পরিশ্রমের মনে করেন না। অপর আরেকটি দলীয় আলোচনা হতে প্রাপ্ত উপাত্তের মাধ্যমে তাদের মতামতটি প্রতিফলিত হয়। তাদের মতানুসারে, পূর্বে যত সহজে পাহাড় হতে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করা যেত, বর্তমানে সেটা সম্ভব হয় না। আগে বাঁশ, কাঠ, লাকড়ি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য পাহাড়ের অধিকতর গভীরে তাদের যেতে হতো না, বেশি উচু পাহাড়ে উঠতেও হতো না, কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে পাহাড়ী উপকরণসমূহ কমে গেছে, ফলে সেগুলো সংগ্রহের জন্য পাহাড়ের অনেক গভীরে যেতে হচ্ছে, উঠতে হচ্ছে উঁচু পাহাড়ে। আর একারণে এই কাজ এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম সাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। পূর্বে মহিলারা পাহাড়ে যেত না, কিন্তু বর্তমানে নিজেদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে কাজ করতে হয়, পাহাড়ে যেতে হয়।

পাহাড় নির্ভর অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল বেশিরভাগ ব্যক্তিদের এটা বাপ-দাদার পেশা। তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই পেশার উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। তবে এই নির্ভরশীলতার প্রকার ভিন্ন হতে পারে। যেমন - অনেকে অন্য পেশায় যাওয়ার আগে মধ্যবর্তী পেশা হিসেবে অর্থনৈতিক চাহিদার জন্য এর উপর নির্ভর করে। এমন অনেকেই আছেন যারা আগে অন্য পেশায় ছিল, কিন্তু আরেকটি ভিন্ন পেশায় যাওয়ার আগে পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং অন্য কাজে যোগ দিয়ে সে আর পাহাড় নির্ভর নয়। আবার এমন অনেকে আছেন যারা আগে পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করতো, এরপর অন্য পেশায় চলে যায় এবং পরবর্তীতে ঐ পেশা ছেড়ে আবার পাহাড় নির্ভর অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়। নিম্নের কেইসটির মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হলো-

কেস ০১

এনাম[৪] (৪৭) ছোটবেলা থেকে মধ্য-মঘাদিয়ার পাহাড়ে যেয়ে পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতো। একসময় সে শহরে এসে শ্রমিকের কাজ করা শুরু করে। কয়েক বছর পর সে মধ্যপ্রাচ্যে যেতে সক্ষম হয় এবং সেখানে সে শ্রমিকের কাজ করতো। কয়েক বছর পর সে ফিরে আসে দেশে এবং পুনরায় পাহাড়ে যাওয়া শুরু করে। কিছু দিন আবার সে শহরে দারোয়ানের কাজ করে। বর্তমানে সে আবার পাহাড় অর্থনীতির সাথে যুক্ত। তবে সুযোগ পেলে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যাওয়ার ইচ্ছা আছে তার। পাহাড়ে পাদদেশে তার নিজস্ব কিছুটা জমি আছে ।

উপরোক্ত কেস থেকে বোঝা যায় যে, পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর পেশা বিভিন্ন কাজের মধ্যবর্তী পর্যায়ে, যখন অন্য কোন কাজ থাকেনা তখন জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ এই পেশার উপর নির্ভর করে। আবার পুরোপুরি পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল লোকেরাও আছে।

উপাত্তদাতা মিয়াধন (৭০) এর মতে *"পাহাড় আছে, পাহাড় থেকে গাছপালা কাটার জন্য। পাহাড়ের গাছ কাটব, না থাকলে অন্য কিছু করব।"* উপাত্তদাতাদের মতানুসারে, বেঁচে থাকার জন্য তারা পাহাড় থেকে গাছপালা কাটছে। তারা প্রতিদিন পাহাড়ে যায় তবে সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরে আসে। এই সংগ্রামের জীবনে পাহাড়, বন, পশুপাখি নিয়ে ভাববে কখন তারা? পাহাড় এবং পাহাড়ের জীব বৈচিত্র্য তাদের জীবিকা নির্বাহের একটা উপায় মাত্র। পাহাড় না থাকলে তারা অন্য কিছু করবে তথা অন্য কাজ করবে। যতদিন পারবে পাহাড় থেকে গাছপালা সংগ্রহ করবে। তাদের সংস্কৃতি পাহাড় নির্ভর অর্থনীতির জন্য আলাদাভাবে গড়ে উঠেনি। স্থানীয় পাহাড় ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তাদেরকে অর্থনৈতিক নির্ভরতার একটা পথ খুলে দিয়েছে মাত্র।

[৪] এই প্রবন্ধে উপাত্তদাতাদের নামের ক্ষেত্রে *ছদ্মনাম* ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষিত জনগোষ্ঠীর মতে,পাহাড়ে জোঁক, মৌমাছি, বোলতা, মশা, মাছি ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের উপদ্রব রয়েছে। স্থানীয় যেসকল মানুষ পাহাড়ে থাকার অনুমতি পায় তারাও বেশীদিন এখানে থাকে না, কারণ বিভিন্ন রোগের প্রকোপ, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া এখানে সবচেয়ে বেশী হয়। বর্ষাকালে পাহাড়ে কেউ সহজে যায় না। কেননা এসময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভবনা বেশী থাকে। পাহাড়ে মাটি কাটার ফলে ভূমি-ধস বর্তমানে বেশী হয়। গাছপালা কমে যাওয়াও ভূমি ধসের প্রধান কারণ। পাহাড়ে ছরা (ছোট খাল) ও ঝর্ণা রয়েছে, এখানে মাছ পাওয়া যায়। তবে এসব জলাশয়ে মাছ কমই থাকে। ইদানিং পাহাড়ের ঢালে নানা প্রকার গাছ লাগানো হয় ও বাগান করা হয়। অনেক স্থানে পাহাড়ের মাঝে রাস্তা চলে গেছে, এইসব রাস্তা দিয়ে ট্রাক, চান্দের গাড়ি, মোটর গাড়ি প্রভৃতি চলে। মাটি, বড় বড় গাছ, কখনো বা লাকড়ির কাঠ প্রভৃতি দিয়ে ভর্তি থাকে এই ট্রাকগুলো।

জীবিকা নির্বাহের জন্য কেউ কেউ পাখি ধরে বিক্রি করে বলে জানা গেছে। উপাত্তদাতারা উল্লেখ করেন যে, এক লোক ধনেশ ও ডাহুক পাখি ধরে বিক্রি করে জীবন-ধারণ করতো বলে তার নামটা হারিয়ে গেছে। লোকে তাকে "ধনা ডাহুইকক্যা" নামে চিনে। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, এখানে এমন অনেকে আছেন পাহাড়ের গাছপালা, লতাপাতা প্রভৃতি এনে তা থেকে নানা প্রকার ঔষধ তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পূর্বে পাহাড় থেকে মাটি সংগ্রহ করা হতো খুবই কম। বর্তমানে এর হার অনেক বেড়ে গেছে। পাহাড় কাটা দেশের আইনে নিষিদ্ধ হলেও, এখানকার অবস্থা দেখে তা মনে হয় না। এখানকার লোকজন একসময় মনে করতো এই পাহাড়ি বনের উপর তারা চিরনির্ভরশীল থাকতে পারবে। তবে পরিবর্তিত নানা প্রেক্ষাপট তাদের এই ধরানাকে এবং পাহাড়ি বনাঞ্চলকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

৫. সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ি প্রতিবেশ

সাম্প্রতিক সময়ে অত্র পাহাড়ি অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী চালু হয়েছে (প্রধান তথ্যদাতা-২, ২০১৯[৫])। যদিও স্থানীয়ভাবে পাহাড়ে কলা ও পেঁপের চাষ বেশি পরিমাণে করা হয়, তবে অন্যান্য প্রজাতির গাছপালাও লাগানো হয় যার মধ্যে একাশিয়াই প্রধান। স্বল্প পরিমাণে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হয়। যদিও ১৯৯৩ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবে সরকার ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো নিষেধ করলেও সরকারী ও বেসরকারী বনভূমিতে এ

[৫] এই গবেষণার যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত ২০১৯ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে। সামগ্রিক প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে 'প্রধান তথ্যদাতা' হলো অন্যতম একটি পদ্ধতি। গবেষণায় দুইজন ব্যক্তি প্রধান তথ্যদাতা হিসেবে তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করেছেন।

গাছটি দেখা যায় (গাইন, ২০০৪)। উপাত্তদাতাদের মতানুসারে, পূর্বে সেগুন ও মেহগনি গাছ লাগানো হলেও বর্তমানে এই গাছ আর লাগানো হয় না। সেগুন ও মেহগনি বাংলাদেশের স্থানীয় প্রজাতির গাছ নয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বনকর্তারা মূল্যবান বৃক্ষ হিসেবে ১৮৭২ সালে প্রথম সেগুন গাছ লাগানো শুরু করে বার্মা থেকে আনা বীজ দিয়ে (গাইন, ২০০৫)। সেগুন মূল্যবান গাছ হলেও পাহাড়ের পরিবেশ ও স্থানীয় অর্থনীতির জন্য এই গাছটি উপকারী নয় বলে উপাত্তদাতারা উল্লেখ করেন।

সেগুন চাষ থেকে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরাই লাভবান হন, যাদের অধিকাংশই বহিরাগত। সেগুন গাছ যেখানে চাষ হয় সেখানকার পরিবেশের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। সেগুন গাছের ছায়ায় অন্য কোন গাছ বা আগাছা জন্মায় না বললেই চলে, বিশেষ করে পাহাড়ের ঢালে। বৃষ্টির মৌসুমে যেসব পাহাড়ে সেগুন বাগান রয়েছে সেখানে প্রচুর মাটি ক্ষয় হয়ে থাকে (গাইন, ২০০৫)। উপাত্তদাতাদের মতে, সেগুন বা এরকম মূল্যবান গাছের রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টকর এবং এই ধরনের গাছ চুরি হয় বেশি বলে ইদানিং আর এ ধরনের গাছ লাগানো হয় না।

উপাত্তদাতাদের মতানুসারে, পাহাড়ে বর্তমানে সামাজিক বনায়নের অংশ হিসেবে আম, জাম, কাঁঠাল, প্রভৃতি লাগানো হয়েছে। তবে একাশিয়া, পেঁপে ও কলা সবচেয়ে বেশী লাগানো হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এসব গাছের ফল ভোগ করতে পারলেও ইচ্ছে মত গাছ কাটতে পারে না, কাটার সময় বন বিভাগের অনুমতি লাগে। কিন্তু স্থানীয় যেসকল মানুষ সামাজিক বনায়নের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা একাশিয়া, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ কেটে বাজারে বিক্রি করে দেয়। তারা আরো উল্লেখ করেন (দলীয় আলোচনা) যে, এই ধরনের ঘটনার জন্য বনবিভাগের লোকদের কিছু টাকা দিলেই তারা আর কিছু বলে না। এরা বনজঙ্গল নিজেদের ইচ্ছামতো কেটে ফেলছে বনবিভাগের লোকজনের সাথে মিলে। ফলে পাহাড়ে আর আগের মতো গাছপালা দেখা যায় না। গাছের সংখ্যার মত পশু-পাখির সংখ্যাও কমে গেছে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী। বাঁশঝাড় আগের মতো আর দেখা যায় না। মথুরা, বনমোরগ প্রভৃতির সংখ্যাও কম। একসময় পাহাড়ের এক প্রকার লতা কেটে সেখান থেকে পানি খেত গবেষিত জনগোষ্ঠীর লোকেরা, সেই লতাও ইদানিং আর তাদের চোখে পড়ে না। হঠাৎ হঠাৎ দুই-একটা রামকুকুর (বুনো কুকুর) দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার পাখি ও সাপ, নানা প্রজাতির হরিণ, হনুমান, বানর, যা পূর্বে সহজেই দেখা যেত সেগুলো আর বেশি দেখা যায় না। বিলুপ্ত হয়ে গেছে গয়াল, ভালুক, কাঠ ময়ূর, চিতাবাঘ প্রভৃতি প্রাণী। আজ থেকে ৭০ বছর আগেও রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখা যেত এখানে, কিন্তু আজ এই প্রাণীটিও বিলুপ্ত। এছাড়া আরও বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে ।

উপাত্তদাতাদের মতে, তারা কোন প্রকার প্রাণী হত্যা করে না বা খাওয়ার জন্যও মারে না। বনবিভাগের লোকজন, সামাজিক বনায়নের সাথে যুক্ত লোকেরা এবং স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন পাহাড়ি বন ও এর পশু-পাখি বিনাশের জন্য দায়ী । তারা গাছপালা কেটে, পশু-পাখি মেরে ফেলে গবেষিত জনগোষ্ঠীকে দায়ী করে। তবে বনবিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, স্থানীয় পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর এসব লোকেরাই এর জন্য দায়ী। তারা লুকিয়ে বনবিভাগের অনুমতি ছাড়া লাকড়ি, বাঁশ, কাঠ সংগ্রহ করে ও অন্যান্য প্রাণী হত্যা করে পাহাড়কে বিরান করে তুলেছে। উল্লেখ্য, কিছু প্রাণী যেমন - শিয়াল, পেঁচা, সাপ প্রভৃতিকে সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষতিকর হিসেবে দেখা হয় বলে অনেক সময় স্থানীয় লোকজনই এদের হত্যা করে থাকে।

৬. পাহাড়-নির্ভর অর্থনীতি ও প্রতিকূল বাস্তবতা

অতীত অবস্থা থেকে বর্তমান সময়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনে। উপাত্তদাতাদের তথ্যানুসারে, আগে কাঠ, বাঁশ, লাকড়ী সংগ্রহের জন্য পাহাড়ের অধিকতর ভেতরে যেতে হতো না, কিন্তু বর্তমানে অনেক ভেতরে যেয়ে এসব সংগ্রহ করতে হয়। এমন অনেকেই আছে যারা ভারত সীমান্তের কাছে বা সীমান্ত পাড় হয়ে ঝুঁকি নিয়ে গাছ কেটে আনে জীবিকা নির্বাহের জন্য। দূরত্ব ও দুর্গমতার জন্য তাদের গ্রামে ফিরে আসতে ২/৩ দিন লাগে। পাহাড় থেকে সংগৃহীত দ্রব্য মীরসরাই বাজার এবং এর আশে পাশের বাজারে মণ হিসেবে বিক্রি হয় যৎসামান্য মূল্যে। অতি পরিশ্রমের পর এই রকম সামান্য টাকা তাদের দিয়ে ব্যবসায়ীরাই অধিক লাভ করছে। উপরন্তু, বর্তমানে পাহাড় দস্যুর[৬] দাপট দেখা যায়। এরা পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল যারা তাদের সংগৃহিত দ্রব্য অথবা টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এমনকি অনেক সময় কোন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে অর্থের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়। এপ্রসঙ্গে নিম্নের কেসটি তুলে ধরা হলো-

কেস ০২

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক মোতালেব আগে পাহাড়ে যেয়ে লাকড়ি, বাঁশ, কাঠ বয়ে এনে বাজারে বিক্রি করতো। এটা বেশী পরিশ্রমের কাজ ছিল ও বাজারে পাইকারী বিক্রেতারা টাকা বেশী দিত না। তারপরও এই পেশায় সে ছিল। একদিন পাহাড়ে যাওয়ার পর তাকে সন্ত্রাসীরা বেঁধে রাখে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় তারা মোতালেবকে ছেড়ে দেয় কিছু টাকার বিনিময়ে। এরপর থেকে সে আর পাহাড়ে যায় না, দোকানে কাজ করে।

[৬] যে সকল মানুষ গবেষিত জনগোষ্ঠীর টাকা-পয়সা এবং সংগৃহিত দ্রব্য কেড়ে নেয় তাদের স্থানয়ভাবে এই নামে ডাকা হয়, তবে কেউ কেউ তাদের সন্ত্রাসী বলে উল্লেখ করেছেন।

গবেষিত জনগোষ্ঠীর মতে, পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় পাহাড়ে ট্রাক যেতে পারতো না। বর্তমানে পাহাড়ের কিছু অংশে ট্রাক আসতে পারে ও বড় বড় গাছ পাহাড় থেকে কেটে নিয়ে যায়। এরপর এগুলো চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব ট্রাক ও মানুষ অনেক সময় সন্ত্রাসীরা আটকে রাখে ও টাকা দিলে ছেড়ে দেয়।

উপাত্তদাতাদের মতানুসারে, আগে পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করতে হলে তারা বন বিভাগ থেকে নামমাত্র টাকায় অনুমতি পত্র নিতে পারত এক মাসের জন্য কিন্তু বর্তমানে অনুমতিপত্রে যে টাকা লেখা থাকে তার থেকে অনেক বেশি টাকা বন বিভাগকে দিতে হয়। বাঁশের জন্য আবার আরো বেশি টাকা দিতে হয়। বন বিভাগের অনুমতিপত্র ছাড়াই অবশ্য বেশির ভাগ লোক পাহাড়ে যায়। কেননা কোথায় কখন বনবিভাগ পাহারা বসায় এটা স্থানীয়দের জানা। তাদের মতে, এলাকার পাহাড়, কেন টাকা দিয়ে তারা সেখানে যাবে? তবে অনুমতিপত্র ছাড়া লাকড়ি সংগ্রাহক ধরা পড়লে তার দা-কুড়াল এবং লাকড়ি বন বিভাগের লোকজন রেখে দেয়। পরে অবশ্য টাকা দিলে ছেড়েও দেয়।

উপাত্তদাতাদের মতে, সমসাময়িক কালে মহিলারাও জীবিকার জন্য পাহাড়ে যায়। পাহাড়ের এক-দুই মাইল ভেতরে যেয়ে ঢেঁকিশাক, বিভিন্ন ফল-মূল, কন্দ, কচু প্রভৃতি সংগ্রহ করে ফিরে আসে। তবে সংগৃহিত এসব দ্রব্য বিক্রির জন্য নয়, নিজেদের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য। তবে মাঝে মাঝে তারা গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের কাছে এসব বিক্রি করে অথবা বিনিময়ে চাল, ডাল বা অন্য কিছু নিয়ে নেয়। যারা দরিদ্র, অভাবের কারণে সেসব মহিলারাই পাহাড়ে যায়। তবে গ্রামের জনগোষ্ঠীর চোখে এটা পছন্দনীয় নয়। এমনকি যেসব মহিলা পাহাড়ে যায় তারাও তাদের পাহাড়ে যাওয়া 'ভাল' মনে করে না এমনকি তারা স্বীকারও করতে চায় না যে, তারা পাহাড়ে যায়। আবার এমন অনেক পাহাড় নির্ভর লোক আছে যারা মাসে দুই একবার অথবা কোন কোন মাসে একবারও পাহাড়ে যায় না শারীরিক অসুস্থতা ও নানাবিধ কারণে। এসব পরিবারের মহিলারা মুড়ি ভেজে ও গ্রামে বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করে সংসার খরচ চালায়। নিম্নের কেসটির মাধ্যমে বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো-

কেস ০৩

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক রহিমা'র স্বামী কোন মাসে পাহাড়ে দুই-একবার যায়, আবার কোন মাসে পাহাড়ে যায় না। এছাড়া সে কোন কাজ করে না তার শ্বাসকষ্ট ও নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে। রহিমা মুড়ি ভেজে ও গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে টাকা যোগাড় করে সংসার চালায়। তার চার মেয়ে ও দুই ছেলে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। বাকিরা স্কুলে পড়ে। সুতরাং দেখা যায়, পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মহিলারা বহন করে, কিন্তু তাদের এই কাজ মূল্যায়িত হয় না। পাহাড় নির্ভর অনেক পরিবারে দেখা যায় মহিলারা এ ধরনের কাজ করছে। স্বামী পাহাড়ে গেলেও অনেক পরিবারে পরিলক্ষিত হয়

মহিলারা গ্রামের বিভিন্ন কাজে যুক্ত থেকে আয় করছে। সংসারের বিভিন্ন প্রয়োজনে মহিলারা টাকাটা ব্যয় করে।

উপাত্তদাতাদের তথ্যানুসারে, ইদানিং মিনি ট্রাক এবং ট্রলিতে করে কাঠ, বাঁশ, লাকড়ি পাহাড় থেকে বাজারে নিয়ে আসে। আগে পাহাড়ের মাটি ব্যাপকভাবে কাটা না হলেও বর্তমানে পাহাড়ের মাটি কেটে বিক্রি করা হয়। পাহাড়ের মাটি রাস্তার কাজে, গর্ত ভরাট করতে, জমি উঁচু করতে ব্যবহার করা হয়। এই মাটি ইটের ভাটাতেও নেওয়া হয়। পাহাড়ে বর্তমানে লাকড়ি সংগ্রাহক এবং স্থানীয় লোকদের অনেকের জমি আছে। সেখানে বেশির ভাগই ছন থাকে, এটা অবশ্য প্রাকৃতিক ভাবেই তৈরী হয়। যখন কাটার সময় হয়, জমি যার সে কেটে নেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি যার সে ফল ভোগ করতে পারেনা। অন্য মানুষজন এসে কেটে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, পাহাড়ে ইদানিং জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। এসব জমিতে শীম, বরবটি, কাঁকরোল, ঝিঙ্গা, কচু প্রভৃতি চাষ হয়। এসব ফসল সজারু, শুকর, হরিণ প্রভৃতি প্রাণী নষ্ট করে। অনেকে ফসলের সময় শুধু টং (মাচা) তৈরী করে ফসল পাহারা দেয় এবং ফসল কেটে পরে নিয়ে যায়। পাহাড়ের মাঝে সমতল ভূমিকে ঘোনা বলে, এখানে ধান চাষ হয়। অনেকে আছে যারা নিজেরা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে অন্যজনকে জমি টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করতে দেয় । পাহাড়ে প্রাকৃতিকভাবে ঝাড়ুর ফুল পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। গবেষিত জনগোষ্ঠীর অনেকে এগুলো বাজারে বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকে বলেছেন, এই ঝাড়ুর ফুল জাপানে রপ্তানি করা হয়। পাহাড়ে কাঠ, বাঁশ, লাকড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করতে যেয়ে দুর্ঘটনা ঘটার নমুনা রয়েছে অনেক, তবে কেউ মারা গেছে এমন শোনা যায়নি।

পাহাড় থেকে সংগৃহীত লাকড়ি চায়ের দোকানগুলোতেই অধিকতর বিক্রি করা হয়। এছাড়া লাকড়ির বিশাল একটা অংশ ইটের ভাটার জন্যও ব্যবসায়ীরা কিনে নেয়। পাহাড় থেকে কাঠ, বাঁশ, লাকড়ি যারা সংগ্রহ করে তাদেরকে নতুন বসবাসকারী, সামাজিক বনায়নের সাথে যুক্ত লোকজন, ভূমির মালিক এদের সকলের সংগে টিকে থাকার চেষ্টা করতে হচ্ছে। কেননা, এরা সকলেই পাহাড়ি বনাঞ্চল বা ভূমি ব্যবহারকারী। পাহাড়ের সম্পদ ব্যবহার কেবল অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, এর ব্যবহারের মাত্রা বিভিন্ন । এভাবে দেখা যায়, বর্তমানে পাহাড়ের উপর নির্ভরশীলতার মাত্রা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

৭. পাহাড় নির্ভর সমতলবাসীদের পেশাগত গতিশীলতা

পাহাড় অর্থনীতির উপর গবেষিত জনগোষ্ঠী আগ্রহ হারাচ্ছে আস্তে আস্তে। অন্য কোথাও সুযোগ পেলেই তারা চলে যাচ্ছে। কেননা তাদের মতে, বর্তমানে পাহাড়ের অনেক ভেতরে যেতে হয় লাকড়ি, বাঁশ, কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। বাঁশের পরিমাণও পাহাড়ে

আর আগের মতো নেই। দুর্গম পাহাড়ের অনেক ভেতরে যেয়ে লাকড়ি, বাঁশ, সংগ্রহ করতে হয়। আগের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রমের হয়ে উঠেছে পাহাড়ে যাওয়া। এছাড়া দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভবনাও বেড়ে গেছে। পাহাড়ে গাছপালা কমে যাওয়া ও মাটি কাটার ফলে ভূমি-ধস হয় প্রায়ই। গাছ পড়ে আহত হওয়ার সংখ্যাও কম নয়। বন বিভাগ, স্থানীয় সন্ত্রাসী এভাবে এতজনকে টাকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। আবার, সন্ত্রাসীরা চাদা নেওয়া ছাড়াও অনেক সময় পুরো টাকাই কেড়ে নেয়। বনবিভাগ প্রায়ই তাদের দা-কুড়াল রেখে দেয় এবং টাকা না দিলে ফেরত দেয় না দা-কুড়াল। এছাড়া বনবিভাগের লোকেরা নিজেরা গাছ কেটে অনেক সময় গবেষিত জনগোষ্ঠীকে দায়ী করে হয়রানি করে। বাজারে তারা লাকড়ি, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতির ন্যয্য মূল্য পায় না এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের বিভিন্নভাবে ঠকায়। পাহাড়ের সম্পদ কমে যাওয়ার ফলে তারা পাহাড়ে যাওয়ার আগ্রহ হারাচ্ছে। তাদের কথায়, *"এতদিন পাহাড়ে গেলে লাকড়ি, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি পাওয়া যেত তাই যেতাম, এখন পাওয়া কষ্টকর হয়ে গেছে তাই যাব না, অন্য কিছু করব"*। পাহাড়ের উপর যারা নির্ভরশীল ছিল তাদের অনেকেই বিভিন্ন পেশায় চলে গেছে। এদের মধ্যে কেউ দোকান দিয়েছেন, কেউ রিকশা চালক, কেউ মজুরের কাজ করছেন, কেউ গ্রামে না থেকে শহরে চলে গেছেন, আবার কেউ মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক হিসেবে চলে গেছেন। আর যারা এখনো এই পেশায় আছে তারাও অন্য পেশায় চলে যেতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে নিম্নের কেস দুটি উপস্থাপন করা হলো-

কেস ০৪

আবদুল (২৫) আগে পাহাড় থেকে বাঁশ সংগ্রহ করতো। তার বাবা ও দাদা এর সাথে যুক্ত ছিল। পাহাড় থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে তাদের সংসার চলতো। বর্তমানে সে গ্রামে রিকশা চালায়। এতে তার রোজগার ভাল এবং সে মনে করে আজকাল পাহাড়ে বাঁশ কমে গেছে এবং বাজারেও কষ্টের তুলনায় তেমন মূল্য পাওয়া যায় না বলে সে এই পেশা ছেড়ে দিয়েছে।

কেস ০৫

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক নিজাম উদ্দিন আগে পাহাড় থেকে লাকড়ি এবং বাঁশ সংগ্রহ করতো। বর্তমানে পশ্চিম দিকের উপকূলীয় বনভূমিতে চলে গেছে। উপকূলীয় বনভূমির ভেতরে চরাঞ্চলে সে মহিষ পালে। মহিষের দুধ, দই প্রভৃতি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। মাঝে মাঝে মহিষ বিক্রি করে। তবে উপকূলীয় বনভূমির লাকড়ি, বাঁশ ও কাঠ বিক্রি করে সে জীবিকা নির্বাহ না করলেও এই বনের লাকড়ি সে গৃহস্থালীর জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহার করে।

উপরের কেস দুইটি হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার জন্য বর্তমানে পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠীর অনেকেই এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। কেউ

কেউ দেশেরই অন্য কোন স্থানে চলে গেছে অথবা গ্রামে রিকশা চালাচ্ছে কিংবা অন্য কোন কাজ করছে।

প্রযুক্তির বিকাশ ও বিশ্বায়নের প্রভাবেও পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল লোকেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উপাত্তদাতারা উল্লেখ করেন, তাদের অনেকেই পাহাড় থেকে যারা বাঁশ সংগ্রহ করে বিক্রি করতো এবং মধ্যম-মঘাদিয়ার একটি পরিবার এই বাঁশ কিনে তা দিয়ে ঝুড়ি, মাদুর প্রভৃতি বানিয়ে বাজারে বিক্রি করতো। বর্তমানে প্লাষ্টিক এই স্থান দখল করে নিচ্ছে এবং প্লাষ্টিকের তৈরী নানা সামগ্রী বাঁশজাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত দ্রব্যের তুলনায় সস্তা ও টেকসই হয়। ফলে গ্রামের মানুষ প্লাষ্টিকের তৈরী জিনিষপত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। এজন্য বাঁশজাত সামগ্রী নির্মাণ করা পরিবারটি ধীরে ধীরে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে এবং যারা বাঁশ কাটত তারা বাঁশ বিক্রি কম হওয়া, বনবিভাগ থেকে পারমিট পেতে সমস্যা, বাঁশের অপর্যাপ্ততা ও স্বল্প বাজার মূল্যের কারণে বাঁশ সংগ্রাহকরা ভিন্ন পেশা গ্রহণ করছে। পাহাড় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অনেকেই বর্তমানে পূর্বের তুলনায় অধিক হারে বিভিন্ন ঋণদাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। এই ঋণের অর্থ দিয়ে তারা বিভিন্ন কাজ শুরু করে। আবার এমনও দেখা যায়, ঋণের টাকা যে উদ্দেশ্যে নিচ্ছে, সে উদ্দেশ্যে তারা সেটা ব্যবহার করে না।

এই গবেষণার সকল উপাত্তদাতাদের সাক্ষর জ্ঞান থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা কারো নেই। তবে তারা বিদ্যালয়ে না গেলেও বর্তমানে তাদের সন্তানরা বিদ্যালয়ে যায়। কারণ হিসেবে একজন প্রধান তথ্যদাতা উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টাকা-পয়সা দেওয়া হয় বলে অনেক অভিভাবকই তাদের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। তিনি আরো উল্লেখ্য করেন যে, এদের কেউই চায় না তাদের ছেলেমেয়েরা পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর হোক। ছেলে বড় হয়ে চাকুরী করে বুড়ো বাপ-মাকে দেখবে ও মেয়ের 'ভাল' বিয়ে দিতে পারবে এই প্রত্যাশায় তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়। পাহাড়ের উপর নির্ভরশীল পিতা-মাতার সন্তানরাও তাদের পূর্বপুরুষের পেশা গ্রহণে আগ্রহী নয়! তারা চাকুরী বা ব্যবসা অথবা অন্য কিছু করতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে নিম্নের কেসটি প্রনিধানযোগ্য।

কেস ০৬

পনের বছর বয়সী গোলাম মাওলা ক্লাস সেভেনে পড়ে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে সে কাজ করে। ফসলের মৌসুমে সাধারণত অল্প টাকার বিনিময়ে সে কাজ পায় বেশী। তার ইচ্ছা সে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে। তার বাবা পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর হলেও সে কখনও পাহাড়ে যায়নি এবং পাহাড়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছাও তার নেই।

সুতরাং দেখা যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শহরের সাথে গ্রামের দুরত্ব কমে আসার সাথে সাথে কিছু সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই শহরে কাজ করতে আগ্রহী। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে দেখা যায় যে, তাদের আশা-আকাঙ্খার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা বড় হয়ে কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ বা পাইলট হতে চায় আবার কেউবা মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক হিসেবে চলে যেতে আগ্রহী। তারা পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর জীবন-যাপন করতে চায় না। এই গবেষণায় দেখা গেছে, পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য এই পেশা গ্রহণ করলেও বর্তমানে এই পেশা নির্ভর থাকার ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে।

৮. উপসংহার

বক্ষমান গবেষণাটিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাহাড় নির্ভরতার কার্যকারণ এবং পেশাগত গতিশীলতার বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে স্থানীয়দের পাহাড় নির্ভর অর্থনীতি, পাহাড়ের প্রতিবেশগত অবস্থা, তাদের জীবন, জীবিকাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ। পাহাড়ের গাছ-পালা ও জীব বৈচিত্র্য কমে যাওয়া, নিরাপত্তাহীনতা, নতুন ধরণের কাজের সুযোগ তৈরি, জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে গবেষিত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তিত দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী, অন্য পেশা নির্বাচনে তাদের আগ্রহী করে তুলেছে। পাশাপাশি, পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর জনগোষ্ঠীর সন্তানদের ভাবনা-চিন্তাও তাদের ঐতিহ্যবাহী এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশার প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। চলমান বৈশ্বিক ও রাষ্ট্রীয় আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও নানাভাবে তাদের প্রভাবিত করেছে, যা তাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শহরের সাথে গ্রামের দূরত্ব কমে আসার ফলেও এসেছে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। এছাড়া ভুমিহীন মানুষদের বনের দিকে চলে আসা ও আবাসন গড়ে তোলা সীমিত পাহাড়ি সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। সম্পদ ব্যবহারে এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থাও তাদের উদ্বুদ্ধ করছে অন্য পেশা নির্বাচনে। এভাবেই তারা তাদের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট আয়ের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য পেশা বাছাই করছে। সর্বোপরি, সমাজ সদা পরিবর্তনশীল, কখনোই স্থির নয়। তাই সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সবসময়ই চলমান।

পাহাড় অর্থনীতি নির্ভর জনগোষ্ঠীর লোকেরা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, বন বিভাগের লোকজনের বিভিন্ন কর্মকান্ড, প্রশাসনিক কর্মচারী, স্থানীয় সাংসদ এবং তাদের অনুসারীদের দায়ী করে পাহাড়ের সম্পদ বিনাশের জন্য। তাদের মতে, বড় বড় গাছগুলো এরাই অর্থের জন্য চুরি করে বিক্রি করে। এছাড়া বিভিন্ন পশু-পাখি হত্যা করে এরাই, আর এর দায় চাপায় পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠীর উপর। পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠী

পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং তারা ব্যবসায়ীদের দ্বারা বিভিন্নভাবে পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে ঠকে। তাদের কাটা গাছের কাঠ, লাকড়ি, বাঁশ (রূপান্তরিত হয় বাঁশজাত উপকরণে) প্রভৃতি পণ্য ছড়িয়ে পড়ে দেশের বাজারসমূহে। অনেক সময় বিভিন্ন পণ্য রপ্তানী হয় বৈদেশিক বাজারে, যেমন ঝাড়ুর ফুল জাপানে রপ্তানী করা হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রকৃতি হলো পণ্য। প্রাকৃতিক সম্পদকে সে ব্যবহার করে কাঁচামাল হিসেবে। গাছ কেটে বন উজার করে প্রাণী হত্যা করে পণ্য উৎপাদনের জন্য। যে পণ্য বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করবে ক্রেতার কাছ থেকে। এভাবে পুঁজিবাদ মুনাফা বা লাভের জন্য ভোগবাদিতাকে উৎসাহিত করে। আর এই ভোগবাদিতার দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠীর উপর। এভাবে তারা বিশ্ব বাণিজ্যের অংশ হলেও নিজেরা থেকে যায় দরিদ্র পাহাড় নির্ভর জনগোষ্ঠী হিসেবেই। উপরন্তু, পাহাড় কেন্দ্রিক যে সকল উন্নয়ন কর্মসূচী (সরকারী ও বেসরকারী) বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলো মূলত পাহাড়ে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা সাপেক্ষেই গৃহীত হয়। কিন্তু সমতলবাসী পাহাড় নির্ভর বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে যায় দৃষ্টির অগোচরে। তাই, রাষ্ট্রীয় পরিসরে পাহাড় কেন্দ্রিক যেকোন নীতি বা পলিসি (সরকারি ও বেসরকারি) নির্ধারন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমতলবাসী পাহাড় নির্ভর বাঙালি জনগোষ্ঠীদের আবশ্যিকভাবে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। যদি সেটা না হয়, তাহলে আমাদের কাঙ্খিত অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন থেকে যাবে অধরাই। আর একারণে বর্তমান এই গবেষণা প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিকভাবে এসংক্রান্ত নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে রাখতে পারে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

গ্রন্থপঞ্জি

ইসলাম, কাজী জাফরুল, (২০০৫), "মীরসরাই"র ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ, " দৈনিক আজাদী সাহিত্য সাপ্তাহিকী ৮ই জুলাই ২০০৫।

খান, মনিরুল ইসলাম, (১৯৯২), কৃষক অর্থনীতি ও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল, সমাজ নিরীক্ষণ / ৪৪; সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গাইন, ফিলিপ, (২০০৫), বাংলাদেশের বিপন্ন বন, বাংলা সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ২০০৫, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা ।

গাইন, ফিলিপ ও অন্যান্যরা (সম্পাদিত), (২০০৪), বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা ।

বাংলাপিডিয়া, (২০১৫), বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

মোড়ল, শিশির, (২০০৪), "বন, বৃক্ষরোপন এবং বনায়ন: অতিকথন ও রাজনীতি" গাইন ফিলিপ (সম্পাদিত), বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম, সোসাইটি ফর এনভাইরনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

Ahamed, F. U. (2012). Negotiating boundaries: dynamics of identity formation in the Chittagong hill tracts (CHT), Bangladesh. In A. K. Danda & R. K. Das (Eds.), *Alternative Voices of Anthropology* (pp. 233 – 259). Kolkata: Indian Anthropological Society, India.

Acharya, S. K., & Kshatriya, G. K. (2014). Social transformation, identity of indian tribes in recent time: An anthropological prospective. *Afro Asian Journal of Anthropology and Social Policy,* 5(2). DOI:10.5958/2229-4414.2014.00008.8

Anon. (2023). Nature-dependent people: Mapping human direct use of nature for basic needs across the tropics. *Science Direct.* Accessed on 01/06/2023

Barnard, Alan. (2004). *History and Theory in Anthropology. Cambridge University Press.*

Bourdieu, P. (1972) *Outline of theory of practice*, Cambridge: Cambridge University Press.

Fedele, G., Donatti, C. I., Bornacelly, I., & Hole, D. G. (2021). Nature-dependent people: Mapping human direct use of nature for basic needs across the tropics. *Global Environmental Change*, *71*, 102368.

Foster. G. M. (1965). Peasant Society and the Image of Limited Good. *American Anthropologist*, 67(2), 293-315. https://doi.org/10.1525/aa.1965.67.2.02a00010

Geertz, Clifford. *(1963). Agricultural Involution. Berkley: UC Press*

Haviland, W. A., Prins H. E. L., McBride, B., & Walrath, D. (2011). *Cultural anthropology: the human challenge (*13th ed.). USA, Wadsworth

Hill Forest. (2023). *Banglapedia*. Accessed on 01/06/2023

Hossain, M. A., & Ahmad, A. (2017). Livelihood status of hill dwellers in Bandarban, Bangladesh. *International Journal of Business, Management and Social Research*, 03 (01), 154-161. Open Accessed at: www.journalbinet.com/ijbmsr-journal.html

Jannat, M., Hossain, M. K., Uddin, M. M., Hossain, M. A., & Kamruzzaman, M. (2018*).* People's dependency on forest resources and contributions of forests to

the livelihoods: a case study in Chittagong Hill Tracts (CHT) of Bangladesh. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*. DOI:10.1080/13504509.2018.1434571

Jewel, K. N. A., Wadud, M. A., Rahman, G. M. M., & Saifullah, M. (2022). Livelihood Development in The Hill Ecosystems of Bangladesh: The Role of Agroforestry. *Tropical Agricultural Research & Extension*, 25 (4). DOI: http://doi.org/10.4038/tare.v25i4.5605

Johnston, T. (2016). Synthesizing Structure and Agency: A Developmental Framework of Bourdieu's Constructivist Structuralism Theory. *Journal of Theoretical & Philosophical Criminology,* Vol. 8(1), 1-17. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/295537758_Synthesizing_Structure_and_Agency_A_Developmental_Framework_of_Bourdieu's_Constructivist_Structuralism_Theory

Khan, N. A., & Begum, S. A. (1997). "Participation in social forestry re-examined; a case-study from Bangladesh". *Development in practice*, 7(3), 260-266

Khondker, H. H., & Schuerkens, U. (2014). 'Social transformation, development and globalization'. *Sociopedia.isa*, DOI: 10.1177/205684601423

Kottak, C. P. (2011). *Cultural anthropology: appreciating cultural diversity* (14th ed.). New York, The McGraw-Hill Companies, Inc.

Miah, M. D., Akther, S., Shin, M.Y., & Koike, M. (2014). Scaling up REDD+ strategies in Bangladesh: a forest dependence study in the Chittagong Hill Tracts. *Forest Science and Technology*, 10:3, 148-156. DOI: 10.1080/21580103.2014.889045

Moran, E. F. (2007 (3rd ed.)). *Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press. Chapter: One*

Papacharissi, Z., & Easton, E. (2013). *In the Habitus of the New: Structure, agency and the social media habitus*. *New Media Dynamics*, 167-184. https://doi.org/10.1002/9781118321607.ch9

Power, E. M. (1999). An introduction to Pierre Bourdieu's key theoretical concepts. *Journal for the study of food and society,* 3(1), 48-52.

Schaefer, R. T., & Lamm, R. P. (1989). *Sociology*. The McGraw-Hill Companies, Inc.

Scoones, I. (2009). Livelihood perspectives and rural development. *The Journal of Peasant Studies, 36(1), 171-196. https://doi.org/10.1080/03066150902820503*

Shanin, T. (ed). (1973). *Peasants and Peasant Societies*. Penguin Book, Hanondsworth